প্রসঙ্গ লাইসেনকো– বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য যা খুবই জরুরী

বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে যুগ যুগ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সুদীর্ঘকালের দ্বন্দ্বের কথা সবারই জানা। যুগে যুগে শাসক শ্রেণী কখনওবা বিজ্ঞানকে প্রতিহত বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে, কখনওবা বিজ্ঞানকে শোষনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে এমন সব নজীর খুজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছিল যার মাধ্যমে বিশ্ব প্রকৃতিতে অপরিবর্তনীয় এবং absolute কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমান করা যায়। অ্যাটমের অবিভাজ্যতার ধারণা ভ্রান্ত প্রমানিত হবার পর মেনডেল এবং তাঁর অনুগামী বিজ্ঞানীরা 'জীন' এর পরিবর্তন স্বীকার করে নিলেও এই পরিবর্তন 'আকস্মিক' বলে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াদের হাতে সেই সুযোগ করে দিলেন। তারা বলতে শুরু করল 'জিনেটিক কোড' বলে একটা লিখন আছে যা মানুষের ভবিষ্যত ঠিক করে দেয়, আর জন্মকালে লিখিত এই কোড ভবিষ্যতে পাল্টায় না। যারা ভাগ্যের লিখনে বিশ্বাসী তারা তো এ কথা শুনে প্রায় লাফ মেরে উঠে বললেন, "দেখেছ, কে বলে ভাগ্যের বিধান নেই? বিজ্ঞান বলছে ভবিষ্যতের লিখন আছে, জিনে ভাগ্য লেখা থাকে।"

এই চিন্তার মূলে আঘাত করেন জীব বিজ্ঞানী ট্রফিম্ ডেনিসোভিচ্ লাইসেংকো (মৃত্য ২০ নভেম্বর' ১৯৭৬)। বিশ্বের কোন ঘটনাই কার্যকারণ সম্পর্ক বহির্ভূত নয়। কিন্তু মেনডেল ও তাঁর অনুগামী বিজ্ঞানীরা 'জীন' এর পরিবর্তনকে পরিবেশ নিরপেক্ষ ও কার্যকারণবিহীন 'আকস্মিক' ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কোন বিশেষ যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য যদি কেউ কোন ঘটনাকে কার্যকারণবিহীন 'আকস্মিক' বলে মনে করেন তাহলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে তিনি (মেনডেল এবং তাঁর অনুগামী মরগ্যান, ভাইসম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা) এক্ষেত্রে ভাববাদী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

লাইসেংকো গবেষণার মাধ্যমে দেখালেন যে, শীতকালীন গমের বীজ vernalisation প্রক্রিয়ায় (যে প্রক্রিয়ায় বপনের আগে বীজকে pre-treatment করা হয়) মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর যদি বপন করা হয় তা হলে সেই বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় সেই গাছে ঐ বছরই ফসল পাওয়া সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় অংকুরোদগমের আগে বীজের সামগ্রিক বস্তুসত্ত্বার সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতের (vernalisation) ফলেই বীজের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে বিকাশলাভ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। আপাতঃ প্রতিকূল পরিবেশ বৃদ্ধি ও বিকাশের অনুকূলে কাজ করেছে। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতের ফলেই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। লাইসেংকোর মতে এই পরিবর্তন বংশানুক্রমিক এবং তিনি এটাই দেখাতে সচেষ্ট হলেন যে বংশাণুক্রমিকতা 'জীন' ও পরিবেশের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি।

কিন্তু মেনডেল, মরগ্যান-এর অনুগামী বিজ্ঞানীমহল লাইসেংকোর এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁরা প্রমান করতে চাইলেন জৈবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের কোন ভূমিকা নেই। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বললেন যে বংশপরম্পরায় ইঁদুরে লেজ কেটে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিহিত হয় না। অনেকে এমন কথাও বললেন যে দুর্ঘটনায় পিতা-মাতার অঙ্গহানি ঘটলেও সন্তানের মধ্যে সেই বিশেষ অঙ্গটি অক্ষত থাকে। এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়ে ঘটনা দেখিয়ে তাঁরা বলতে চাইলেন যে পরিবেশ জীবদেহের অঙ্গজবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে কিন্তু তার ফলে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন ঘটে তা বংশাণুক্রমিক নয়। অতএব বংশাণুক্রমিক পরিবেশ নিরপেক্ষ। লাইসেংকোর মতে সকল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনই বংশাণুক্রমিক হবে না। যেগুলো জীবদেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, কেবল সেগুলোই হবে বংশাণুক্রমিক। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে বাইরে থেকে ক্রিয়াশীল কোন একটা কিছু (agent) একটা ব্যবস্থার উপর তার বাইরের স্থুল জগতে (macro world) প্রভাব ফেললেও তার অভ্যন্তরস্থ সুক্ষ্ম জগতে (micro world) প্রভাব ফেলতে সক্ষম নাও হতে পারে। সুতরাং যে পরিবেশ জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেই পরিবেশ জননকোষের অভ্যন্তরস্থ সুক্ষ্মজগতে কোনও কার্যকারী প্রভাব নাও ফেলতে পারে। মনে রাখা দরকার যে বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন তখনই বংশাণুক্রমিক হবে যখন সেই পরিবর্তনটি কোষ অভ্যন্তরে সুক্ষ্ম জগতে কোনও প্রভাব ফেরতে সক্ষম। পরিবেশ যদি সুক্ষ্ম মাত্রায় ক্রিয়া করে 'জীন' এর অভ্যন্তরে কার্যকারী প্রভাব ফেলতে পারে, তবে তা সন্তানদের মধ্যেও নিহিত হবে। যেমন, হিরোসীমায় যখন বোমা ফেলা হয়, তখন তেজষ্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণে সেখানকার মানুষদের মধ্যে এমন প্রভাব পড়ে যা তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও পরবর্তীকালে নিহিত হতে দেখা গেছে। একটা গোটা জাতি বংশপরম্পরায় বিকলাঙ্গ হয়েছে বা নানা রোগ নিয়ে জন্মেছে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমান করে যে পরিবেশ এক্ষেত্রে অতি সুক্ষ্ম মাত্রায় ক্রিয়া করে 'জীন' এর অভ্যন্তরে কার্যকারী প্রভাব ফেলে তার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। পরিবেশ বলতে জীবের বাহ্যিক স্থুল পরিবেশকেই ধরলে চলবে না, জীবদেহের অভ্যন্তরের সুক্ষ্ম পরিবেশ (micro molecular environment) সেটাকেও যুক্ত করে সুক্ষ্ম ও স্থুল উভয় প্রকার পরিবেশের সঙ্গে জীবদেহের অবস্থান এবং দ্বন্দ্বসংঘাতকে বুঝতে হবে।

বিজ্ঞানী লাইসেনকো বলেন, পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে জীবদেহে বংশাণুক্রমিক বৈশিষ্ট্যর প্রকাশ সম্ভব নয়। জীবদেহ ও তার পরিবেশ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। এইভাবে না বুঝলে জীন-এর উপর অহেতুক ঝোঁক বাড়তে বাধ্য। অনুকূল পরিবেশে বৃদ্ধি ও বিকাশের সবকটি উপাদান বর্তমান থাকে। প্রতিকূল পরিবেশে এই উপাদানগুলো হয় অনুপস্থিত থাকে অথবা জীবদেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। জীবন সংগ্রামেরত জীব প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপযোগী উপাদানগুলো সংগ্রহ করে থাকে। এই সংগ্রামের ফলেই জীন-এর পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবেশের সঙ্গে জীন-এর এই দ্বন্দ্ব সংঘাতকে তিনি সংগ্রাম বলে বুঝিয়েছেন। এই সংঘাতকে সঠিকভাবে ধরতে না পারলে প্রজাতিসৃষ্টি তথা সমগ্র জীবজগতের বিবর্তনের ধারা বোঝা সম্ভব নয়।

লাইসেংকো আজ জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই তাকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেই ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব লেলিন রিসার্চ সেন্টারের পদ থেকে লাইসেংকোকে অপসারিত করে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁর চিন্তাধারার গবেষণার কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। লাইসেংকো তাঁর ব্যাপক গবেষণার মধ্য দিয়ে যে তত্ত্বের দিক উন্মোচিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেটা যদি বর্জন করতেও হয়, তার যথার্থতা বিচার করেই

বর্জন করা সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ষ্টালিনের সময়কার বিজ্ঞানী বলেই লাইসেংকো সম্পর্কে বিশিষ্ট (!) বিজ্ঞান লেখক জনাব অভিজিৎ রায়-এর মন্তব্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা সহজেয় অনুমেয়। বর্তমান সময়ে বংশাণুক্রম সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা গড়ে তোলা এবং তাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য গবেষণা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রিক বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন, বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া শুধুই কুৎসা রচনা বা ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আত্মতৃপ্তি পাওয়া গেলেও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন কখননোই সম্ভব নয়।